সবুজবিপ্লবী

পুনর্জিৎ রায়চৌধুরী

১৯৪৩ সাল। দুর্ভিক্ষে বিপর্যস্ত বাংলা। চারিদিকে তীব্র খাদ্য সঙ্কট, চালের জন্য কালোবাজারি, সর্বহারাদের হাহাকার ‘একটু ফ্যান দাও’। সর্বভারতীয় দৈনিকগুলিতে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে সেই বিপর্যয়ের খবর। “সেই খবরগুলি পড়তে পড়তেই আমি সিদ্ধান্ত নিই যে খাদ্য নিরাপত্তা নিয়েই কাজ করব। দেশের জন্য যদি কিছু করতেই হয় তাহলে খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করার থেকে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নেই, মনে হয়েছিল আমার। তার আগে অবধি ঠিক ছিল জেব আমি মেডিকাল স্কুলে যাব, বাবার তৈরি হাসপাতাল সামলাব...” ২০১৯-এ একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন এম এস স্বামীনাথন। ২০২৩-এ দাঁড়িয়ে মনে হয়, ভাগ্যিস খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করার কথা ভেবেছিলেন সেদিনকার বছর আঠারোর যুবক স্বামীনাথন! না হলে, ১৯৭১-এ খাদ্য উৎপাদনে ভারতকে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে যে সবুজ বিপ্লব বিপুলভাবে সাহায্য করেছিল, সেই সবুজ বিপ্লব আমরা হয়তো কোনওদিন প্রত্যক্ষই করতাম না! কারণ সবুজ বিপ্লবের জনক যে স্বামীনাথন—সেটা দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন ভাবে বলা যায়।

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর অবসান ঘটল এম এস স্বামীনাথনের কর্মময় জীবনের। আটানব্বই বছর বয়সে চেন্নাইয়ে নিজের বাসভবনে প্রয়াত হলেন তিনি যিনি ছিলেন একাধারে কৃষিবিদ, কৃষি বিজ্ঞানী, উদ্ভিদ জীনতত্ত্ববিদ এবং প্রশাসক। বাবা ছিলেন গান্ধীবাদী, ডাক্তার। মাও গান্ধীজীর একনিষ্ঠ ভক্ত—নিয়ম করে কিশোর স্বামীনাথনকে চরকায় খাদি বোনানো অভ্যাস করাতেন তিনি। মাদ্রাসে স্কুলের পাঠ শেষ করে স্বামীনাথন ভর্তি হন কোয়েম্বাটুরের মাদ্রাজ অ্যাগ্রিকালচারাল কলেজে। উদ্দেশ্য—খাদ্য উৎপাদন নিয়ে পড়াশোনা করা, গান্ধীজির ‘স্বদেশী’ (বা স্বনির্ভরতা) দর্শনকে দেশের খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেও কী করে প্রয়োগ করা যায় সেটা শেখা (মা-বাবার অনুপ্রেরণায় ততদিনে স্বামীনাথনও গান্ধীজির ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন)। সেই উদ্দেশ্য পূরণ করতেই উদ্ভিদ জীনতত্ত্ব এবং ফসলের উন্নতির উপায়-বিষয়ক গবেষণায় মনোনিবেশ। স্বামীনাথনের নিজের কথায়, “বিশেষ করে এই দু’টি বিষয়ে আমি মনোনিবেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম কারণ আমার মনে হয়েছিল এই বিষয়গুলি ভাল করে আয়ত্ত করতে পারলে আমি দেশের সর্বাধিক সংখ্যক কৃষককে সাহায্য করতে পারব।”

স্নাতোকত্তর পড়াশোনার জন্য ১৮৪৭-এ কোয়েম্বাটুর থেকে দিল্লি পৌঁছন স্বামীনাথন, ভর্তি হন ইন্ডিয়ান অ্যাগ্রিকালচারল রিসার্চ ইন্সটিটিউটে। তার দু’বছর বাদে নেদারল্যাণ্ডসে পাড়ি জমান তিনি, যোগ দেন ওহানিঙ্গেন অ্যাগ্রিকালচারল ইউনিভার্সটির ইন্সটিটিউট অফ জেনেটিক্সে ইউনেস্কো ফেলো হিসাবে। ১৯৫০-এ পিএইচডি করার জন্য কেমব্রিজে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন স্বামীনাথন। ১৯৫২-এ পিএইচডির পাঠ চুকিয়ে স্বামীনাথন আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে পৌঁছে যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ইউনিভার্সিটি অফ উইসকন্সিন-এ যোগ দেন পোস্ট-ডক্টরল রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট হিসাবে। ১৯৫৩-র ডিসেম্বরে স্বামীনাথনের অ্যাসোসিয়েটশিপ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইউনিভার্সিটি অফ উইসকন্সিনের তরফ থেকে তাঁর কাছে চাকরির প্রস্তাব আসে। সে প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন তিনি, ফিরে আসেন দেশে। প্রথমে যোগ দেন কটকের সেন্ট্রাল রাইস রিসার্চ ইন্সটিটিউটে এবং তারপর ইন্ডিয়ান অ্যাগ্রিকালচারল রিসার্চ ইন্সটিটিউটে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোভনীয় চাকরির না গ্রহণ করে তাঁর দেশে ফিরে আসা প্রসঙ্গে স্বামীনাথন পরবর্তীকাল মন্তব্য করেছিলেন, “দেশের জন্য কাজ করার জন্য দেশে না ফেরা ছাড়া আমার উপায় ছিল না।”

স্বামীনাথন যখন দেশে ফিরে আসেন, তখন ভারতীয় কৃষি-অর্থনীতির দশা, দুশো বছরের ব্রিটিশ শাসনের কল্যাণে, রীতিমতো সঙ্গিন। এক দিকে ভারতের ৯০ শতাংশ মানুষ কৃষি নির্ভর হওয়া স্বত্বেও ভারতকে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হচ্ছিল বাধ্য হয়ে (বস্তুত, ১৯৬৬-এ ভারত ২ কোটি টন খাদ্যশস্য আমদানি করেছিল)। অন্য দিকে, দেশের নানা প্রান্তে খরা ও দুর্ভিক্ষের মতো ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছিল আস্তে আস্তে। খাদ্য সংকটের এই পরিস্থিতি বেশিদিন চলতে পারে না—বুঝতে পেরেছিলেন স্বামীনাথন-সহ অনেকেই। পরিস্থিতি পাল্টানোর জন্য তাই মার্কিন কৃষিবিদ নরম্যান বোরলগের (যিনি পরবর্তীকাল কালে নোবেল শান্তি পুরস্কার পান) সঙ্গে যৌথ ভাবে শুরু করেন গবেষণা। স্বামীনাথন এবং বোরলগ মেক্সিকান এবং জাপানি বামন জাতের গমের 'ক্রসিং' করেন। এই ক্রসিং-এর ফলে তৈরি হয় উচ্চ-ফলনদায়ী এবং রোগমুক্ত বীজ (এইচ ওয়াই ভি অথবা হাই ইল্ডিং ভ্যারাইটি সিডস্)। এই উন্নত বীজ, কীটনাশক আর সার ব্যবহার করে এবং জলসেচের পদ্ধতির আধুনিকরণ ঘটিয়ে পশ্চিম ভারত—মূলত পঞ্জাব এবং হরিয়ানায়—কৃষিক্ষেত্রের আমূল সংস্কার করা হয় যাকে বলা হয় সবুজ বিপ্লব।

সেই সময় এবং পরবর্তীকালেও, সবুজ বিপ্লব নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। যে বিষয়গুলি এই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে থেকেছে বরাবর সেগুলি হল—উন্নত বীজ থেকে ভাল ফলনে পেতে কৃষকদের কীটনাশক এবং জলের যথেচ্ছ ব্যবহার, সবুজ বিপ্লবের সুবিধে কেবল উত্তর ভারতের কতিপয় পুঁজিবাদি কৃষকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়া, আন্তঃ-রাজ্য অসাম্য বৃদ্ধিতে সবুজ বিপ্লব সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করা, ইত্যাদি। তবে যতই বিতর্ক থাক, তৎকালীন ভারতে উদ্ভূত খাদ্য সঙ্কট এবং খাদ্যশস্যের জন্য বিদেশি রাষ্ট্রনির্ভরতা অনেকাংশে কমানো গিয়েছিল সবুজ বিপ্লবের জন্য, এটা মেনে নিতেই হয়। এবং এর কৃতিত্ব মূলত স্বামীনাথনকেই দিতে হয় কারণ সবুজ বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল তাঁরই কাজের মাধ্যমে। সবুজ বিপ্লবের সাফল্য প্রসঙ্গে ২০১৪-এ জাতিসংঘকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে স্বামীনাথন মন্তব্য করেছিলেন, "মহেঞ্জোদারোর সময় থেকে শুরু করে গত চার হাজার বছরে ভারতীয় উপমহাদেশের গম চাষের যে ফলন, ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৮, মাত্র এই চার বছরে, সেই ফলন দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল"।

গবেষণা করার পাশাপাশি সারা জীবন বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছিলেন স্বামীনাথন। ১৯৭২ সালে, স্বামীনাথন ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ-এর অধিকর্তা এবং ভারত সরকারের সচিব হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৯৮২ সালে, তিনি ফিলিপিন্সের ইন্টারন্যাশনাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর প্রথম এশিয়ান অধিকর্তার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ২০০৪-এ ন্যাশানল কমিশন অফ ফার্মার্স-এর প্রধান হিসেবে তিনি একাধিক রিপোর্ট প্রণয়ন করেন। রিপোর্টগুলিতে ছিল ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস) সংক্রান্ত সুপারিশ, দ্রুত এবং আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধির জন্য পরামর্শ এবং কৃষক-আত্মহত্যার বিষয়ে একটি সামগ্রিক জাতীয় নীতির রেখাচিত্র। ২০০৭-এ রাষ্ট্রপতি মনোনীত সদস্য হিসাবে স্বামীনাথন যোগ দেন রাজ্যসভায়ও।

তাঁর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার পেয়েছিলেন স্বামীনাথন। 1987 সালে তিনি প্রথম বিশ্ব খাদ্য পুরস্কারে ভূষিত হন। তার আগে পেয়েছিলেন ম্যাগসেসে পুরস্কার, পদ্মশ্রী এবং পদ্মভূষণ। ১৯৮৯-এ পান পদ্মবিভূষণ। এছাড়াও সাম্মানিক ডক্টরেট পেয়েছেন ইউনিভার্সিটি অফ উইসকন্সিন, ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেটস-সহ বিশ্বের নানা বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে।

স্বামীনাথনকে নিয়ে, তার গবেষণা নিয়ে, সাধারণ মানুষের মধ্যে ইদানীং আর তেমন আগ্রহ চোখে পড়ে না। এটা দুর্ভাগ্যের হলেও হয়তো কালের নিয়ম। স্বামীনাথনের মতো মানুষরা তো আর সেই অর্থে 'সেলিব্রিটি' নন যাদের নিয়ে মাতামাতি করতে হবে কিংবা যাদের সঙ্গে সেলফি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করতে হবে! তবে ভারতবাসী হিসেবে এটা হয়তো আমাদের মনে রেখে দেওয়াটা কর্তব্য, আধুনিক ভারতের অন্যতম রূপকার সবুজবিপ্লবী এম এস স্বামীনাথন।

কৃষিবিজ্ঞানে তাঁর যুগান্তকারী কাজ কোটি কোটি ভারতীয়র জীবন বদলে দিয়েছে। ভারত হয়তো এখন পুরোপুরি খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করতে পারেনি। তবে যতটুকু পেরেছে সেটা যে প্রধানত স্বামীনাথনের জন্যই, এ কথা অনস্বীকার্য।

দেশ, ১৭ অক্টোবার ২০২৩